

فَصَّصْنَا لَكَ الْقُرْآنَ

কুরআনের গল্প

সূচি

লেখকের কথা.....	৭
ইবলিশ বনাম আদম	৯
কুরবানি নিয়ে দুই নবি-পুত্রের দ্বন্দ্ব.....	১১
সাড়ে নয় শ বছর দ্বীনের দাওয়াত	১৪
নবির অবাধ্য পুত্র	১৭
কাফির বাবার সাথে নবির কথোপকথন	১৯
ইব্রাহিম .. নবির বিতর্ক.....	২১
কুরবানি : বাবার স্বপ্ন, ছেলের ধৈর্য	২৩
আত্মবিশ্বাসের সাথে দায়িত্বের দাবি	২৭
ঝোপ বুঝে কোপ.....	৩০
মায়ের উৎকণ্ঠা.....	৩২
মুসা .. নবির শিক্ষাসফর	৩৫
অহেতুক প্রণয়ের বিড়ম্বনা	৩৯
একটি সিজদার জন্য.....	৪১
আল্লাহর নিদর্শনের অবমাননা	৪৪
পাপ কাজের সমর্থক	৪৬
সুলাইমান .. নবির স্যাফ্রিফাইস	৪৭
পিতার রায়, পুত্রের দ্বিমত	৫২
পিপীলিকার কথোপকথন	৫৬
মানুষ থেকে বানর	৫৯
সুলাইমান .. নবির দু'আ	৬৩
জাদু বিদ্যা ও দুজন ফেরেশতা.....	৬৬
এক ধৈর্যশীল নবির গল্প	৬৮

মাছের পেটে আল্লাহর নবি.....	৭০
এক জনপদে তিন রাসুল	৭৩
সন্তানের প্রতি বাবার উপদেশ	৭৬
অসম্ভব কিছু চাওয়া.....	৮০
সিক্রেটস	৮২
এক বাগান মালিকের গল্প.....	৮৪
গুহাবাসী যুবকেরা	৮৭
চরিত্র নিয়ে অপবাদ দেয়া সত্ত্বেও...	৯৩
“সে তো জাহান্নামে যাবে!”	৯৭

লেখকের কথা

‘গল্প’ শব্দটি শুনলেই আমরা চনমনিয়ে উঠি। যেকোনো বয়সের মানুষ গল্প শুনতে ভালোবাসে, গল্প পড়তে ভালোবাসে। গল্পকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য বেশিরভাগ গল্পকথক ও গল্পলেখক গল্পকে অতিরঞ্জিত করেন। গল্পের কিছু অংশ থাকে সত্য, কিছু অংশ থাকে কল্পনা। ফলে, গল্প শব্দটি শুনলেই মনে হয় সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ অনেকগুলো ঘটনা উল্লেখ করেন। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা নিয়ে আলাদা একটি সূরা নাজিল করেন। কুরআনের ভাষায় সেই ঘটনাকে আল্লাহ উল্লেখ করেন ‘কাসাস’ নামে। বাংলায় আমরা এই শব্দকে সাধারণত কিছা-কাহিনি, ঘটনা, গল্প বলে অভিহিত করি।

তবে, কুরআনের গল্প আর প্রচলিত গল্পের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। কুরআনের গল্পে কোনো মিথ্যা কথা নেই, কোনো অতিরঞ্জন নেই; নেই কোনো কল্পকাহিনি। মহান আল্লাহ মিথ্যা কোনো ঘটনা কুরআনে উল্লেখ করেননি। আল্লাহ কুরআনে বারবার রেটোরিকাল প্রশ্ন করেছেন, ‘আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী কে হতে পারে?’

পবিত্র কুরআনের গল্পগুলো এভারগ্রিন। যেকোনো সময়, যেকোনো দেশের, যেকোনো ভাষার মানুষ এই গল্পগুলোর সাথে নিজেদেরকে কানেক্ট করতে পারেন। কুরআনের একটি গল্প থেকে একশ্রেণির পাঠক একধরনের বার্তা পাবেন, আরেক শ্রেণির পাঠক আরেক ধরনের বার্তা পাবেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কুরবানির গল্প থেকে কেউ পাবেন ধৈর্য, আনুগত্যের সবক; কেউবা পাবেন প্যারেন্টিংয়ের লেসন।

‘কুরআনের গল্প’ বইয়ের বেশিরভাগ গল্প বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে আমরা কী শিখতে পারি সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ এই গল্পগুলো শুধু বিনোদনের জন্য নাজিল করেননি, আমাদের শিক্ষার জন্য নাজিল করেছেন। এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে গল্পগুলো সাজানো হয়েছে।

‘ইলহাম’ বইটি প্রকাশ করেছে। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ কৃতজ্ঞ মাসুদ শরীফ ভাইয়ের প্রতি।

বইয়ের যা কিছু ভালো, সব আল্লাহর পক্ষ থেকে। কোনো ভুলত্রুটি চোখে পড়লে আমাদের জানানোর অনুরোধ।

আরিফুল ইসলাম

কাপাসিয়া, গাজীপুর

১২ ডিসেম্বর ২০২১

ariful459203@gmail.com

ইবলিশ বনাম আদম

ইবলিশ যেমন ভুল করেছিল, তেমনি আদমও  একটি ভুল করেছিলেন। দুজনই ভুল করার পর আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন, আল্লাহ আদমকে  মাফ করলেও ইবলিশকে মাফ করেননি।

আল্লাহ ইবলিশকে আদেশ (Command) দেন আদমকে  সিজদা করার জন্য। কিন্তু সে সিজদা না করে উল্টো যুক্তি দেখিয়েছিল। আল্লাহ ইবলিশের অহংকার দেখে বলেছিলেন, “তুই জ্ঞাত থেকে নেমে যা। এখানে তোর অহংকার দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। অতএব তুই বেরিয়ে যা, তুই লাজ্জিতদের দলভুক্ত।”

[সূরা আল-আরাফ ৭:১৩]

ইবলিশও আল্লাহর কাছে দুআ করেছিল। দেখুন তার দুআর ভাষা—

“হে আমার রব! তাহলে আমাকে অবকাশ দিন কিয়ামত পর্যন্ত।”

[সূরা আল-হিজর ১৫:৩৬]

আল্লাহ ইবলিশের দুআ কবুল করে বললেন—

“আচ্ছা, তুই অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলি।”

[সূরা সা'দ ৩৮:৪০]

ইবলিশ কিন্তু নাস্তিক ছিল না, সে আল্লাহকে অবিশ্বাস করেনি, সে বরং আল্লাহকে ‘বিশ্বাস’ করে। তার দুআ ভাষায় দেখুন সে আল্লাহকে বলছে ‘রাব্বি, হে আমার রব।’ আল্লাহকে ‘রব’ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও সে কাফির। কারণ, আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছে। তাহলে আমি-আপনি কীভাবে মনে করি, আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছি বলেই আমরা নিশ্চিত। আমরাও কি ইবলিশের মতো আল্লাহকে বিশ্বাস করেও আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছি না?

ইবলিশের মতো নিকৃষ্ট শয়তানেরও দুআ আল্লাহ কবুল করেছেন। আমরাও কি আশা করব না, আমাদের দুআগুলোও আল্লাহ কবুল করবেন?

আদমকে  আল্লাহ বলেন, জ্ঞাতের একটি গাছের কাছে না যেতে। কিন্তু আদম  আল্লাহর এই নিষেধাজ্ঞা (Prohibition) অমান্য করেন। তারপর আল্লাহ আদম-হাওয়াকে  জ্ঞাত থেকে নেমে যাবার আদেশ দেন।

আল্লাহ ইবলিশকে জান্নাত থেকে বের করে দেন, আদমকেও ﷻ জান্নাত থেকে বের করে দেন। দুজনই ভুল করেছিলেন।

এখন দেখুন, অপরাধ করার পর ইবলিশের প্রতিক্রিয়া কী ছিল...

“হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আমিও পৃথিবীতে সবাইকে নানান সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং সবাইকে পথভ্রষ্ট করব।”

[সূরা হিজর ১৫:৩৯]

ইবলিশ পাপ করার পর পাপের বোঝা নিজের উপর না নিয়ে সে উল্টো আল্লাহকে অভিযুক্ত করছে—‘আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন।’ তার কী অহংকার!

অন্যদিকে আদম-হাওয়া ﷻ ভুল করার পর তারা কী প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন দেখুন...

“হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আর এখন আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, আমাদেরকে দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।”

[সূরা আল-আরাফ ৭:২৩]

আদম-হাওয়ার ﷻ দুআ মধ্যে আছে বিনয় আর ইবলিশের দুআ মধ্যেই আছে অহংকার। বিনয়ীর বিনয়কে আল্লাহ সন্মান দিয়েছেন, তাঁর মর্যাদাকে আল্লাহ উন্নীত করেন আর অহংকারীর অহংকারকে আল্লাহ পতন ঘটান; যেমনটা ইবলিশের হয়েছে।

আদম-হাওয়া (আলাইহাস সালাম) ভুল করেছেন, ইবলিশ পাপ করেছে এখন আমরাও গুনাহ করে যাচ্ছি। তাহলে সবাই যদি ভুল করে তাহলে আদম ﷻ আর ইবলিশের মধ্যে পার্থক্য কী?

নবিজি ﷺ খুব সুন্দর একটা জবাব দেন।

“প্রত্যেক আদম সন্তানই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তাওবাকারী।”

[জামে আত-তিরমিজি:২৪৯৯ (হাদিসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য)]

তারমানে এই জায়গায় আদম ﷻ আর ইবলিশের মধ্যে পার্থক্য। আদম ﷻ তাওবা করেছেন, ইবলিশ তাওবা তো করেনি, উল্টো আল্লাহকে অভিযুক্ত বানিয়েছে!

তাহলে আমরা কার মতো প্রতিক্রিয়া দেখাবো? ইবলিশের মতো নাকি আদমের ﷻ মতো?

কুরবানি নিয়ে দুই নবি-পুত্রের দ্বন্দ্ব

নবি আদমের ﷺ ছেলেদের মধ্যে দুজন ছেলের নাম ছিল, হাবিল ও কাবিল। হাবিল-কাবিলের সংঘাত মানব ইতিহাসের প্রথম সংঘাত। মানব ইতিহাসের সূচনালগ্নেই দেখা যায় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল।

সংঘাতের মূল কারণ তাফসিরে পাওয়া যায়। তখন মায়ের গর্ভে দুজন সন্তান জন্ম নিত। একজন ছেলে, আরেকজন মেয়ে। আদম ﷺ-এর সময়ে বিধান ছিল যে, একসাথে জন্ম নেয়া জমজ ভাই-বোনদের বিয়ে হবে না, বিয়ে হবে পরের দুজনের মধ্য থেকে একজনের সাথে। অর্থাৎ, একই গর্ভে জন্ম নেয়া দুজন হলেন ‘ক’ (ছেলে), ‘খ’ (মেয়ে)। পরেরবার জমজ সন্তান হলেন ‘গ’ (ছেলে), ‘ঘ’ (মেয়ে)। ‘ক’ এর সাথে বিয়ে হবে ‘ঘ’ এর; ‘খ’ এর না।

হাবিলের যমজ বোনকে বিয়ে করবে কাবিল, আর কাবিলের যমজ বোনকে বিয়ে করবে হাবিল। এটাই ছিল নবি আদম ﷺ এর শরিয়াত। সমস্যা দেখা দিল যে, হাবিলের বোন সুন্দরী ছিলেন না। ফলে, কাবিল হাবিলের বোনকে বিয়ে না করে নিজের বোনকে বিয়ে করতে চাইল।

মানব ইতিহাসের সূচনালগ্নেই দেখা যাচ্ছে, বিয়েতে সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করে!

তখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, দুই ভাই আল্লাহর নামে কুরবানি করবেন। যার কুরবানি আল্লাহ কবুল করবেন, তার সাথেই কাবিলের বোনের বিয়ে হবে। [তাফসির ইবনে কাসির:২/৬৪২]

আমাদের সময়ে কার কুরবানি কবুল হয়েছে, কারটা হয়নি সেটা বুঝার কোনো সুযোগ নেই। তখন সেটা বুঝা যেত। যার কুরবানি কবুল হতো, আকাশ থেকে অগ্নিশিখা এসে তার কুরবানির বস্তু ভস্মীভূত করে দিত।

দেখা গেল যে, হাবিলের কুরবানি আল্লাহ কবুল করলেন। অর্থাৎ, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিয়েটি হবে। কাবিলের কুরবানি আল্লাহ কবুল করলেন না।

কাবিলের কুরবানি কবুল হলো না। এখন সে কী করবে? সে আল্লাহর বিধান অমান্য করে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সেটাও হলো না; তারউপর কুরবানিও কবুল হলো না। সে নিজের দিকে না তাকিয়ে, নিজের ভুল আমলে না নিয়ে, নিজেকে

সংশোধনের চেষ্টা না করে উল্টো কাবিলকে বলল—“আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব।”

কুরবানি কবুল হয়নি তারটা। এখানে হাবিলের দোষ কী? সে নিজের কাজ ঠিকমত না করে, রাগে-জেদে, প্রতিহিংসায় হাবিলকে হত্যা করতে চায়। এমন মানসিকতা আমাদের অনেকেরই আছে। আমরা কোনো ভুল করলে, কোথাও ব্যর্থ হলে নিজেদের ভুল আর ব্যর্থতা ঢাকতে গিয়ে যারা সফল তাদের দোষারোপ শুরু করি।

যেমন: দুই ভাই একই ক্লাসে পড়ে। এক ভাই অংকে ৯০ পেল, আরেক ভাই ৫০। যে ৯০ পেল, মা-বাবা তাকে বেশি আদর করলেন, তাকে পুরস্কার দিলেন। যে ৫০ পেল, তাকে এতটা মূল্যায়ন করলেন না। এখন যদি সে পরিকল্পনা করে, ‘এই ভাই থাকলে মা-বাবা আমাকে আদর করবেন না, আমি এই ভাইকেই মেরে ফেলি’ সেটা কি সুন্দর দেখায়? এটা তো নবি ইউসুফের ﷺ ভাইদের মতো হয়ে গেল। বাবার বেশি আদর পেতে গিয়ে তারা তাদের ভাইকে হত্যা করার মনস্থ করে।

কাবিলের প্রতিহিংসার জবাবে হাবিল বললেন:

“আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকিদের পক্ষ থেকে (কুরবানি) কবুল করেন। আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি তোমার হাত প্রসারিত করলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি আমার হাত প্রসারিত করব না। নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহকে ভয় করি। নিশ্চয়ই আমি চাই তুমি আমার ও তোমার পাপ নিয়ে ফিরে যাও। ফলে তুমি জাহান্নামের অধিবাসী হও, এটা জালিমদের প্রতিদান।”

[সূরা মাযিদাহ ৫:২৭-২৯]

কাবিলের কুরবানি না হওয়ায় হাবিলকে হত্যা করতে চাইলে হাবিল জানিয়ে দেয় যে, কুরবানি তো তাদেরই কবুল হয়, যারা মুত্তাকি। তোমার কুরবানি কবুল হয়নি তো আমাকে হত্যা করে কী করবে? নিজের তাকওয়া নিয়ে যদি ভাবতে, সেটাই তোমার জন্য ভালো ছিল। আর তারপরও যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাইব না। তুমি আমাকে হত্যা করলে তুমি আমার পাপের বোঝাও নিজের কাঁধে নিয়ে নেবে।

কাবিল প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে শেষমেশ তার ভাইকে হত্যা করে ফেলে। সে ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম হত্যাকারী। সে অন্যায়ভাবে তার ভাইকে হত্যা করে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:

“অন্যায়ভাবে যে ব্যক্তিকেই হত্যা করা হোক না কেন, তার রক্তের একাংশ আদম ﷺ এর ছেলে কাবিলের উপর বর্তায়। কেননা, সেই সর্বপ্রথম তার ভাই

| হাবিলকে হত্যা করে।”

[সুনানে আন-নাসাঈ:৩৯৮৫]

কোনো একটা ভালো কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে যারা সেটার অনুসরণ করবে, সূচনাকারীর অংশে সওয়াব যোগ হবে। তেমনি কেউ যদি খারাপ কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তার দেখাদেখি সেটা যারা করবে, তাদের পাপের বোঝাও সূচনাকারীর আমলনামায় যোগ হবে।

কাবিল হাবিলকে হত্যা করে একটি বংশধারাকে শেষ করে দেয়। নতুবা হাবিলের ঘরে যাদের জন্ম হতো, তারা একটি স্বতন্ত্র বংশধারা বিস্তার করত। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই ঘটনা উল্লেখের পর বলেন:

“হত্যা বা জমিনে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সমগ্র মানব জাতির প্রাণ রক্ষা করল।”

[সূরা মায়িদাহ ৫:৩২]

হাবিল-কাবিলের গল্পে দেখা যায় যে, কাবিল হাবিলকে হত্যার মাধ্যমে মানব জাতির একটা বংশধারাকেই সমূলে শেষ করে দিল। এই মেটাফোরের আলোকে পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে, তাদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ সতর্কবাণী জানিয়ে দিচ্ছেন যে—তাদের সেই অপরাধ, পুরো মানব জাতিকে হত্যার অপরাধের সমান।

কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা ইসলামে সবচেয়ে বড় কবির গুনাহগুলোর মধ্যে অন্যতম। রাসুলুল্লাহ ﷺ কবির গুনাহের মধ্যে তিনটি বড় গুনাহের কথা উল্লেখ করেন—

- ❧ আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা
- ❧ কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং
- ❧ মা-বাবার অবাধ্য হওয়া [সহিহ বুখারি:৬৮৭১]

কাবিলের মনে হত্যাবোধ জন্মেছিল হিংসাবোধ থেকে। আমাদের মনের অশান্তি, অন্যের প্রতি দোষারোপ, নিজের ভুল স্বীকার না করে অন্যের ভুল নিয়ে মেতে থাকা এসবের মূল কারণ দেখা যায় হিংসা। এই হিংসা আমাদের পতন ডেকে আনতে পারে। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন হিংসা থেকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন—

“তোমরা অবশ্যই হিংসা পরিহার করবে। কারণ, আগুন যেভাবে কাঠকে খেয়ে ফেলে, তেমনি হিংসাও মানুষের নেক আমলকে খেয়ে ফেলে।”

[সুনানে আবু দাউদ:৪৯০৩]

মাড়ে নয় শ বছর দ্বীনের দাওয়াত

নূহ ﷺ ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত প্রথম রাসূল। তাঁর পূর্বে যাদেরকে আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন, তারা ছিলেন নবি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কওমের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত প্রচার করেন। তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন।

তিনি তাঁর কওমকে বলেন:

“হে আমার কওম! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন। আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসলে কিছুতেই তা বিলম্ব করা হয় না; যদি তোমরা জানতো।”

[সূরা আন-নূহ ৭১:২-৪]

তিনি রাত-দিন, প্রকাশ্যে-গোপনে তাঁর কওমকে দ্বীনের দাওয়াত দেন। তারা তো তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করত না, উল্টো তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখত; যাতে করে তারা নূহ নবির ﷺ আহ্বান শুনতে না পায়। এটা ছিল চরম অপমান।

আপনি কাউকে দাওয়াত দিতে গেলেন, সে আপনার দাওয়াত তো শুনছেই না, উল্টো আপনাকে ইগনোর করা শুরু করল, আপনি দাওয়াত দিতে গেলে সে যেখানে বসা ছিল, সেখান থেকে উঠে চলে যায়। ব্যাপারটি আপনার ভালো লাগবে?

নূহ ﷺ-এর কওম প্রতিনিয়ত এমনটাই করত। তবুও তিনি তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যেতেন। নিজেকে নূহ ﷺ নবির জায়গায় রেখে চিন্তা করুন। আপনি বন্ধুদেরকে নামাজ পড়তে বলেন, পাপ কাজ ছেড়ে দিতে বলেন, কিন্তু তারা আপনাকে নিয়ে হাসি-তামশা করে, আপনাকে নিয়ে মজা করে। আপনি কয়দিনই বা তাদের কাছে দাওয়াত দেবেন? তাদের সাথে কথা বলতে গেলে নিজের কাছে খারাপ লাগবে না? মানুষ সহজে অপমান সহ্য করতে পারে না।

অথচ নূহ ﷺ মনোবল না হারিয়ে দাওয়াত দিতেই থাকেন। একপর্যায়ে তাঁর কওম যখন দেখল যে, এভাবে অপমান করা সত্ত্বেও তিনি তাদের পিছু ছাড়ছেন

না, তখন তারা তাঁকে হুমকি দিয়ে বলল:

“হে নূহ! তুমি যদি (দাওয়াত দেয়া থেকে) বিরত না হও, তবে
অবশ্যই আমরা পাথর মেরে তোমাকে হত্যা করব।”

[সূরা আশ-শুযা'রা ২৬:১১৬]

তিনি মানুষের কাছে ঘুরে-ঘুরে ভিক্ষা চাচ্ছেন না। তিনি মানুষকে কিছু দিতে বলছেন না। তিনি শুধু মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত, সত্যটা পৌঁছে দিতে চাচ্ছেন। এতেই মানুষ তাঁর উপর ক্ষোভে গেল! তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দিল।

চিন্তা করুন, তিনি কতটা অপমান সহ্য করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিলে মানুষই বরং তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে তাঁকে হত্যা করতে চায়? অথচ বিরক্ত হবার কথা ছিল তাঁর নিজের। তিনি বছরের পর বছর দাওয়াত দিয়েই যাচ্ছেন, তেমন কেউ সাড়া দিচ্ছে না। তাঁকে অপমান করছে, হুমকি দিচ্ছে!

তিনি একটানা প্রায় সাড়ে নয়শো বছর দ্বীনের দাওয়াত দেন! একবছর সমান ৩৫৪ (চন্দ্র বছর) দিন হলে সাড়ে নয়শো বছর সমান ৩,৩৬,৩০০ দিন হয়! একজন মানুষ তিন লক্ষ ছয়ত্রিশ হাজার দিন মানুষের কাছে শুধু দ্বীনের দাওয়াতই দিয়ে যান। একদিন, দুইদিন না।

আমরা আমাদের আশপাশের মানুষকে একবার, দুইবার নামাজের কথা বলে তারা সাড়া না দিলে বিরক্ত হয়ে পড়ি। আমরা মনে করি যে, তাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দেবেন না। অথচ নূহ  আল্লাহর একজন রাসূল হওয়া সত্ত্বেও, সর্বোত্তম পদ্ধতিতে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তিনি হতাশ হয়ে পড়েননি। একদিন তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেনি, পরদিন আবার দাওয়াত দিতে যান; এভাবে ৩ লক্ষ দিনের বেশি তিনি শুধু মানুষকে দাওয়াত দিয়েই যান।

তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেয় আনুমানিক মাত্র ৮০ জনের মতো মানুষ। সেই ৮০ জনের মধ্যে তাঁর স্ত্রী-পুত্র ছিল না! যিনি বাইরের মানুষের কাছে এত দাওয়াত দিয়েছেন, তিনি নিজ পরিবারে কী রকম দাওয়াত দিয়েছেন চিন্তা করা যায়? তবুও তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি।

দাওয়াতের সফলতা সাড়া দেবার উপর নির্ভর করছে না। যেভাবে দাওয়াত দেবার কথা, সেভাবে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে কিনা সেটাই আসল কথা। দাওয়াত দেবার এই চেষ্টার ফলেই আল্লাহ দাঁষ্টর আমলনামায় সওয়াব দান করবেন।

পবিত্র কুরআনে রসূলগণ দাওয়াত দিতে গিয়ে জানিয়ে দেন যে,

তারা কেবল সতর্ককারী মাত্র।

[সূরা আল-হজ্জ ২২:৪৯, আয-যারিয়াত ৫১:৫০]

পৃথিবীতে যারা দাওয়াতি কাজ করেন, তাদের দায়িত্ব হলো দ্বীনের দাওয়াত

মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। রাসুলের একটি অর্থ হলো বার্তা বাহক। যারা দা'ঈ, তারাও দ্বীনের বার্তা বাহক; নবি-রাসুলের উপর যে বার্তা এসেছে, তারা সেই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।

যারা দা'ঈর ভূমিকা পালন করেন, তারা নূহ ﷺ নবির মতো দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেবেন, নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন, আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। সেই দাওয়াতে যদি কেউ সাড়া দেয়, তাহলে তো সোনায়ে সোহাগা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবি আলীকে ﷺ বলেন:

“আল্লাহর কসম! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে যদি আল্লাহ মাত্র একজন মানুষকে হেদায়াত দেন, তাহলে সেটা তোমার জন্য লাল রঙের (মূল্যবান) উটের মালিক হবার চেয়েও উত্তম।”

[সহিহ বুখারি: ৪২১০]

আমাদের সময়ে যেমন আইফোন, মার্সিডিজ গাড়ি, বসুন্ধরা-গুলশানে ফ্ল্যাটের মালিক হওয়াকে মূল্যবান সম্পদ মনে করি, তৎকালীন আরবে তেমন উদাহরণ ছিল লাল রঙের উট। রাসুলুল্লাহ ﷺ সেই উদাহরণ দিয়ে সাহাবিকে বুঝালেন যে, মানুষ তোমার দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করলে সেটা এত মূল্যবান সম্পদ পাবার চেয়েও উত্তম।

উম্মতে মুহাম্মদীর প্রত্যেকেই একেকজন দা'ঈ। আল্লাহ আর কোনো নবি-রাসুল পাঠাবেন না। নবি-রাসুলের দাওয়াতের সেই কাজ আমাদেরকেই করতে হবে।

নবির অবাধ্য পুত্র

নবি নূহের ﷺ একজন অবাধ্য ছেলে ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। নূহ ﷺ তাকে অনেকবার দাওয়াত দেন, তবুও সে দাওয়াত কবুল করেনি। মহাপ্লাবন শুরু হবার আগে নূহ ﷺ শেষবারের মতো নিজের ছেলেকে ডাকলেন—

“হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ করো, কাফিরদের
সাথে থেকে না।”

[সূরা হুদ ১১:৪২]

যিনি আহ্বান করেন, তিনি একইসাথে ছিলেন তার বাবা ও নবি। দুটোর একটি পরিচয়কেও যদি সে সম্মান জানাত, তাহলে সে সাড়া দিত। কিন্তু, তা না করে সে যুক্তি দেখায়, সে পাহাড়ের উপর উঠবে। তার যুক্তি ছিল এমন—আমি যদি পাহাড়ে উঠি, পাহাড়ের উপর তো আর পানি পৌঁছাবে না।

অথচ যখন মহাপ্লাবন শুরু হয়, তখন পাহাড়ের উপর পানি পৌঁছায়। নবিপুত্রের যুক্তির মতো তার নিজেরও সলীল সমাধি হয়। সে শুধু তার বাবা-নবির অবাধ্য হয়নি, সে অবাধ্য হয়েছিল স্বয়ং আল্লাহর। আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে সে যুক্তি দাঁড় করিয়েছিল! তার এমন যুক্তিবাদী প্রবণতা তাকে ধ্বংস করে। তার অহংকারের পতন ঘটে।

নূহ ﷺ যখন নিজের পুত্রকে ডুবতে দেখলেন, তখন আল্লাহর কাছে একটি প্রশ্ন করলেন। আল্লাহ বলেছিলেন, আল্লাহ তাঁর পরিবারকে রক্ষা করবেন। কিন্তু, ছেলেটি তাঁর আপন ছেলে ছিল, তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তবুও আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন না কেন। নূহ নবি ﷺ দোটানায় পড়ে গেলেন। একদিকে তিনি জানেন আল্লাহর ওয়াদা সত্য, আরেকদিকে তিনি নিজের চোখে দেখলেন তাঁর আপন ছেলে পানিতে ডুবে মারা গেল। তাঁর কৌতূহলী মন জানতে চাইল—এই দুটোর সমন্বয় কীভাবে করবেন?

তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে আমার রব! আমার এই পুত্রটি তো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য, আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।”

[সূরা হুদ ১১:৪৫]

তাঁর কৌতূহলের জবাবে আল্লাহ বলেন, “হে নূহ! সে নিশ্চয়ই তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎ কর্মপরায়ণ। সুতরাং, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, আমার কাছে তা চেয়ো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেন মূর্থদের অন্তর্ভুক্ত না হও।”

[সূরা হুদ ১১:৪৬]

আল্লাহর কাছে এমন বিষয় জিজ্ঞেস করার জন্য নূহ ﷺ ক্ষমাপ্রার্থনা করে দু’আ করেন—

“হে আমার রব! আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা হতে আশ্রয় চাচ্ছি, যে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই। আর আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, তাহলে আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাব।”

[সূরা হুদ ১১:৪৭]

আল্লাহ এই ঘটনায় ‘পরিবার’ সম্পর্কে নবিকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জানালেন। নবি মনে করেছিলেন রক্তসম্পর্কীয় মানুষগুলোই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ জানিয়ে দিলেন সম্পর্কটা ইমানের। একজন মুমিনের কাছে আরেকজন মুমিন তার পরিবারের মতো আপন। সাহাবিদের জীবনে দেখতে পাই তারা আরেকজন সাহাবিকে নিজের অমুসলিম আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন।

সমাজের অনেক সৎ ব্যক্তি, আলেম পরিবারেরও অবাধ্য সন্তান থাকে। তারা বাবার মতো সৎভাবে জীবনযাপন না করে বেছে নেয় অসৎ জীবন। নূহ ﷺ নবির ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ যেন জানিয়ে দিলেন—বাবা ভালো হলে সবসময় সন্তান ভালো হবে, এমনটা না-ও হতে পারে।

পরিবারে দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেকে যেমন সফল হবেন, অনেকেই তেমন ব্যর্থ হবেন। তাই বলে দাওয়াত বন্ধ করা যাবে না। পরিবারের সবাইকে যেমন দাওয়াত দিতে হবে, বাইরের মানুষকেও দাওয়াত দিতে হবে। এমন না যে, পরিবার শতোভাগ ঠিক করে পরে বাইরে যাব। নিজের পরিবারে শতভাগ ‘দাওয়াতি সফল’ সকল নবিরিও ছিলেন না। অনেকসময় পরিবারের মানুষ সহজে দাওয়াত গ্রহণ করতে চায় না। তখন থেমে গেলে হবে না। বাইরেও বের হতে হবে। একজন দা’ঈর ভূমিকা দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। সৎকাজের আদেশ করা, অসৎ কাজের নিষেধ করা। কে গ্রহণ করল আর কে গ্রহণ করল না এটা মুখ্য না। আল্লাহ কুরআনের অসংখ্য জায়গায় সেটা জানিয়ে দেন।

কাফির বাবার সাথে নবির কথোপকথন

নবি ইব্রাহিমের ﷺ বাবা ছিলেন আযর। তিনি ছিলেন একজন মূর্তিপূজারি। শুধু মূর্তিপূজারিই না, মূর্তি বানানো ছিল তার পেশা, তার জীবিকা। এই মূর্তি বানিয়েই তার সংসার চলে। পূজার জন্য তাকে যেমন মূর্তি বানাতে হতো, তেমনি ব্যবসার জন্যও তাকে মূর্তি বানাতে হতো।

একদিন ইব্রাহিম ﷺ তাঁর বাবাকে একটি যৌক্তিক প্রশ্ন করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আব্বু, যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোনো কাজে আসে না, তুমি তার ইবাদাত কেন করছ?”

ইব্রাহিম ﷺ বিনয়ের সাথে বাবাকে বললেন, “আব্বু, আমার নিকট তো এসেছে (এমন) জ্ঞান, যা আপনার নিকট আসেনি। সুতরাং, আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব।”

এই উক্তির মাধ্যমে তিনি বাবাকে অজ্ঞ প্রমাণ করছেন না, বরং এটা বুঝাচ্ছেন যে তিনি যে কাজটি করছেন সেটা যৌক্তিক না এবং সেটা যে যৌক্তিক না তা তিনি বুঝেছেন জ্ঞানের মাধ্যমে। সেই জ্ঞানের পথেই তিনি তাঁর বাবাকে আহ্বান জানাচ্ছেন। সেই জ্ঞান তিনি নিজেই অর্জন করেছেন এভাবে না বলে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাঁকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন।

ইব্রাহিম ﷺ আবারও তাঁর বাবাকে বললেন, “আব্বু, আপনি শয়তানের ইবাদাত করবেন না। শয়তান তো আল্লাহর অবাধ্য। আব্বু, (আপনি এমনটা করতে থাকলে) আমি আশঙ্কা করছি যে, আপনাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং আপনি শয়তানের সাথি হয়ে যাবেন।”

[সূরা মারইয়াম ১৯:৪২-৪৫]

কাফির বাবার প্রতি নবি ইব্রাহিমের ﷺ কথোপকথনের ভাষা ছিল দাওয়াতি ভাষা। দাওয়াতি ভাষায় তিনি যেমন বিনয়ালম্বন করেন, তেমনি ﷻ আল্লাহর অবাধ্যতার শাস্তির কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

ছেলের দাওয়াতি আহ্বান আযরের ইগোতে লাগল। যে ছেলেকে তিনি জন্ম দিয়েছেন, বড় করেছেন, সেই ছেলে কিনা তাকে এসে উপদেশ দিচ্ছে? তিনি তার ছেলেকে ধমকের সুরে বললেন, “ইব্রাহিম, তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে

বিমুখ হচ্ছ? যদি এসব কাজে নিবৃত না হও, তাহলে জেনে রাখো—আমি পাথরের আঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও।”

ইব্রাহিম ﷺ বাবার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে দাওয়াত নিয়ে যাননি। তিনি দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন বাবাকে সত্য পথের অনুসারী বানাতে। কিন্তু, নিজের আত্মমর্যাদার কারণে বাবা ছেলের দাওয়াত তো গ্রহণ করলেনই না, উল্টো ছেলেকে মেরে ফেলার হুমকি দিলেন।

আমাদের পরিবারগুলোতেও এমনটা হয়। ছেলে-মেয়ের মধ্যে দ্বীনের বোধ যখন আসে, তখন তারা চায় তাদের মা-বাবাও দ্বীন মেনে চলুক। সমাজ যেভাবে দ্বীন মেনে চলছে সেভাবে নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক দ্বীনের অনুসরণ। বাবাকে হারাম উপার্জন বর্জনের কথা, মাকে পরিপূর্ণ পর্দা মেনে চলার কথা বললে তারা এভাবে রি-অ্যাঙ্ক করেন। তারা মনে করেন, যে সন্তানকে তারা ‘মানুষ’ করলেন, সেই সন্তান এসে তাদেরকে বুঝাবে? সন্তানের বুঝের মতো চলতে হবে? না, কক্ষনো না।

এমন অহংকারের ফলে তারা সত্য গ্রহণে বিরত থাকেন। সন্তানকে নানানভাবে ধমক দেন, হুমকি দিতে থাকেন। তাই বলে আমাদেরকে দাওয়াত বন্ধ করে দিলে হবে না। আমাদেরকে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

বাবার হুমকির জবাবে ইব্রাহিম ﷺ বলেন, “তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আমি তোমার দিক থেকে এবং তোমরা যারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করো তাদের দিক থেকে পৃথক হচ্ছি। আমি আমার রবের আহ্বান করি, আশা করি, আমার রবের আহ্বানে আমি ব্যর্থ হব না।”

বাবার তাঁকে তাড়িয়ে দেবার পরই ইব্রাহিম ﷺ চলে যাচ্ছেন। তবুও বলে যাচ্ছেন যে, বাবার জন্য দু’আ করবেন। বাবার প্রতি এটা তাঁর মানবীয় আবেগ। যদিও আল্লাহ পরবর্তীতে বলেন যে, মুশরিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা নবি ও অন্যান্য মুমিনদের জন্য বৈধ নয়।

ইব্রাহিম ﷺ তাঁর বাবার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার সুযোগ ছিল না। কারণ, তাঁর বাবা ছিলেন মুশরিক। আল্লাহ নিষেধ করার আগ পর্যন্ত তিনি বাবার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

আমাদের মা-বাবা তো মুসলিম। তারা হয়তোবা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে, আত্মহংকারের কারণে যেভাবে ইসলাম মেনে চলা উচিত সেভাবে মেনে চলতে পারছেন না। দাওয়াত দেবার পরও যদি দেখতে পাই যে, তারা দাওয়াত গ্রহণ করছেন না, তাহলে আমরা তাদের হেদায়াতের জন্য দু’আ করতে পারি।

ইব্রাহিম ﷺ নবির বিতর্ক

ইব্রাহিম ﷺ জীবনে বেশ কয়েকবার বিতর্ক করেন। প্রতিপক্ষকে তাদের যুক্তি দিয়ে ঘায়েল করেন। তিনি নিজেই প্রতিপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন করেন, সেটা আবার খণ্ডন করেন। তিনি বিতর্ক করেন মূর্তিপূজারীদের সাথে, তারকাপূজারীদের সাথে, নমরুদের সাথে।

এলাকার সবাই একটি উৎসব পালন করতে একদিনের জন্য এলাকা ছেড়ে চলে গেলে তিনি থেকে যান। সেদিন দেবমন্দিরে গিয়ে ছোট মূর্তিগুলো ভাঙেন। কুড়ালটি রেখে দিলেন বড় মূর্তিটির কাছে। লোকজন এসে দেখল তাদের মূর্তিগুলো ভাঙা হয়েছে। তারা সবাই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইব্রাহিমকে ﷺ ডাকল। তিনি এসে অদ্ভুত কথা বললেন—“তাদের এই বড় মূর্তিটি এই কাজ করেছে। এদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি এরা কথা বলতে পারে।”

তঁার জবাব শুনে লোকজন রাগ করল। এটা তো কমনসেন্সের বিষয়। মূর্তি কি কথা বলতে পারে? তিনি এবার তাদের কথা ধরলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন, তাহলে তোমরা কিসের ইবাদাত করো, যে কোনো উপকার করতে পারে না; না তোমাদের, না তার নিজের? তাকে ভেঙে ফেললেও সে কিছু বলতে পারে না, সে তোমাদেরকে বাঁচাবে কীভাবে?

[সূরা আশ্বিয়া ২১:৬২-৬৭]

আরেকবার ইব্রাহিম ﷺ বিতর্ক করেন তারকাপূজারীদের সাথে। আকাশের একটি নক্ষত্র দেখে বললেন, “এটাই আমার রব।”

কিন্তু, যখন এটা অস্তমিত হলো, তখন যুক্তি দেখালেন—“অস্তগামীদেরকে আমি ভালোবাসি না।”

অর্থাৎ, নক্ষত্রটি যদি আমার রব হতো, সেটা তো অস্ত যেত না।

আকাশে উজ্জ্বল পূর্ণিমার চাঁদ দেখলে বলে উঠলেন, “এটাই আমার রব।”

কিন্তু, চাঁদও অস্ত গেলে তিনি পাল্টা যুক্তি দেখালেন।

অতঃপর সূর্য উঠলে তিনি বললেন, “এটা তো বড় (আগেরগুলোর চেয়ে)। এটাই আমার রব।” সন্ধ্যার সময় সূর্য অস্ত গেলে তিনি আবার যুক্তি দেখালেন।

[সূরা আন'আম ৬:৭৬-৭৮]

তারকাপূজারীদের সাথে বিতর্কের সময় ইব্রাহিম ﷺ যতবার ‘এটাই আমার রব’ বলেছেন, এসব কথার মাধ্যমে তিনি সংশয় প্রকাশ করেননি। তিনি মূলত তাঁর কথার মাধ্যমে তারকাপূজারীদের মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করেন। অতঃপর সেই যুক্তির পালাটা যুক্তি হাজির করেন। এই বিষয়টিকে বলা যায়—মাথায় তুলে আছাড় মারা।

মানুষের সাথে বিতর্ক করা, প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তি উপস্থাপন করা নবি ইব্রাহিমের ﷺ সুন্য। বিতর্ক করা দাওয়াতের একটি পদ্ধতি। বর্তমান সময়ে অনেক বিতর্কিক ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, একত্ববাদ, আল্লাহর অস্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—হামজা জর্জিস, মুহাম্মদ হিজাব, আদনান রশিদ, শাব্বির আলীর কথা।

প্রায় দেড়শো বছর আগে বাংলাদেশের যশোরে একজন বিতর্কিক ছিলেন। তিনি তৎকালীন সময়ের খ্রিষ্টান মিশনারীদের সাথে বিতর্ক করতেন। তাঁর নাম ছিল মুনশি মেহেরুল্লাহ।

একবার এক খ্রিষ্টান তর্কিক মুনশি মেহেরুল্লাহকে প্রশ্ন করল—“ইসলাম ধর্ম তো হাস্যকর। কারণ, ইসলাম ধর্মে জান্নাতের সংখ্যা ৮ টি আর জাহান্নামের সংখ্যা ৭ টি। অথচ জাহান্নামিদের সংখ্যা বেশি, জান্নাতিদের সংখ্যা কম হবে। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ কাফির, তার উপর অনেক মুসলিমও জাহান্নামে যাবে। এত বিশাল সংখ্যক জাহান্নামিদের জন্য জাহান্নাম রাখা হলো ৭ টি অথচ কম সংখ্যক জান্নাতিদের জন্য জান্নাত রাখা হলো ৮ টি। এরচেয়ে বড় কৌতুক আর কী হতে পারে?”

মুনশি মেহেরুল্লাহ ধীরেসুস্থে উত্তর দিলেন। “আচ্ছা জনাব, বাদুর দেখেছেন?”

খ্রিষ্টান তর্কিক বললেন, “হ্যাঁ, দেখেছি।”

“ময়না দেখেছেন?”

“হ্যাঁ দেখেছি।”

“রাতের বেলা বুনো শিকারিরা ত্রিশ-চল্লিশটি পর্যন্ত বাদুর শিকার করে। দিনের বেলা মাত্র একটি বস্তায় ঠাসাঠাসি করে সবগুলো বাদুর বস্তাভর্তি করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, ময়না পাখি পোষার জন্য আমরা একটি বিশাল খাঁচা কিনে নিয়ে আসি। বিশাল খাঁচায় মাত্র একটি ময়না পাখি থাকে। আর ৩০-৪০টি বাদুরের জন্য একটি মাত্র বস্তা। দুটোই তো পাখির মতো। তাহলে দুটোর জন্য দুই ধরনের ব্যবস্থা কেন? এটা কি হাস্যকর?”

মুনশি মেহেরুল্লাহর যুক্তি শুনে খ্রিষ্টান তর্কিক স্তব্ধ হয়ে যান।

কুরবানি : বাবার স্বপ্ন, ছেলের ধৈর্য

মানুষ যে বয়সে বাবা হবার আশাই ছেড়ে দেয়, ঠিক সেই বয়সে নবি ইব্রাহিমকে ﷺ আল্লাহ একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। প্রায় আশি বছর বয়সে একজন ব্যক্তি যখন বাবা হবেন, তখন তিনি কতটা আনন্দিত হবেন চিন্তা করা যায়?

ইব্রাহিম ﷺ তাঁর স্নেহের সন্তানের নাম রাখলেন ইসমাইল ﷺ। বাবা-মায়ের আদরের সন্তান ইসমাইল ﷺ বড় হতে লাগলেন।

ইসমাইল ﷺ যখন বাবার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলেন, সেটা হতে পারে তাঁর কিশোরকাল; তখন তাঁর বাবা একটি স্বপ্ন দেখলেন।

ইব্রাহিম ﷺ স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি তাঁর সেই আদরের ছেলেকে জবাই করছেন। অদ্ভুত স্বপ্ন বটে! যিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন একজন সন্তানের জন্য, তিনিই কিনা স্বপ্নে দেখলেন যে, সেই সন্তানকে জবাই করছেন।

নবিগণের স্বপ্ন হলো আল্লাহর ওহি। নবিগণ স্বপ্নে যা দেখেন, সেটা মূলত আল্লাহ ওহি প্রেরণ করেন। তিনি যেহেতু স্বপ্নে দেখছেন তাঁর ছেলেকে জবাই করছেন, সেটা নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাই বলে আমরা এরকম স্বপ্ন দেখলে এভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আমাদের স্বপ্নের মাধ্যমে কাউকে হত্যা করার পরিকল্পনা করতে পারি না।

স্বপ্ন দেখার পর সাথে সাথেই তিনি ছুরি নিয়ে ছেলেকে জবাই করতে চলে যাননি। স্বপ্নে যা দেখেছেন, তাঁকে সেটা পালন করতে হবে। আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে 'না' বলার অবকাশ নেই। তবুও তিনি তাঁর ছেলেকে গিয়ে পুরো ঘটনাটি খুলে বলে জিজ্ঞেস করলেন, “বাবা, ভেবে বলো এই বিষয়ে তোমার কী মত?”

ইব্রাহিম ﷺ আল্লাহর একজন নবি হিসেবে বিধানটি অবশ্যই পালন করতে হতো। তবুও তিনি এখানে ‘প্যারেন্টিং’-এর একটি কৌশল সমস্ত পৃথিবীর বাবা-মাকে শিখিয়ে যাচ্ছেন।

সন্তানকে নিয়ে মা-বাবা অনেক সময় বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয়। হতে পারে সন্তানকে এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে ভর্তি করানো, ভালোভাবে পড়ালেখা করার জন্য তাকে হোস্টেলে পাঠানো, সন্তানকে আলেম বানানোর জন্য তাকে মাদ্রাসায় পাঠানো ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে বাবা-মা যেন স্বেচ্ছাচারী আচরণ না করেন সেটাই

ইব্রাহিম ﷺ এই ঘটনায় শিথিয়ে যাচ্ছেন। সন্তান ছোট হতে পারে। কিন্তু, তাকে নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হলে সেক্ষেত্রে তার মতামতও যেন জেনে নেয়া হয়। সে যদি বাবা-মায়ের মতের বিরুদ্ধে মতপোষণ করে, তাহলে যেন তাকে বুঝানো হয় অথবা মন দিয়ে তার মতামতগুলোও যেন শোনা হয়।

সন্তানের ভালোর জন্য মা-বাবার সিদ্ধান্ত যেন সন্তানের উপর চাপিয়ে দেয়া না হয়, সেটাও আমরা এই ঘটনা থেকে শিখতে পারি। এই ধরনের প্যারেন্টিংকে বলে ‘Toxic Parenting’; যেখানে মা-বাবা সন্তানকে গুরুত্ব না দিয়ে সন্তানের উপর চাপ প্রয়োগ করেন।

নবি ইব্রাহিম ﷺ যখন ছেলের কাছে মতামত জানতে চান, তখন ছেলে ইসমাইল ﷺ বললেন:

“আব্বু, আপনাকে যা বলা হয়েছে আপনি তাই করুন। নিশ্চয়ই
আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।”

[সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০২]

কথায় আছে, ‘বাপ কা বেটা, সিপাহি কা ঘোড়া।’ অর্থাৎ, বাবা যেমন, ছেলেও তেমন। আদরের সন্তানকে জবাই করার কথা বলতে বাবার কষ্ট হলেও তাঁকে সেটা করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে। ঐদিকে ছেলেও বাবাকে বলছেন, আল্লাহ আপনাকে যা বলেছেন, আপনি তাই করুন, আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, আমাকে তো ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন।

ইসমাইল ﷺ বাবার প্রস্তাব শুনে বলেননি, ‘আপনি এসব কী বলছেন? পাগল হয়েছেন? স্বপ্নে দেখলেন আর আমাকে মেরে ফেলবেন? বললেই হলো!’

তিনি জানতেন যে, তাঁর বাবা একজন নবি। বাবা যা স্বপ্নে দেখেছেন, তাঁকে সেটাই করতে হবে। সেই হিসেবে তিনি বাবার মতের সাথে সহমত পোষণ করছেন এবং বাবাকে উল্টো মোটিভেশন দিচ্ছেন—আপনি তাই করুন।

বাবা-ছেলে দুজনই বিনা বাক্যে আল্লাহর নির্দেশ মাথা পেতে নিলেন। আল্লাহর নির্দেশের ক্ষেত্রে তারা ‘শুনলাম এবং মেনে নিলাম’ নীতি অবলম্বন করলেন। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা হলো, যখনই আমরা কোনো কিছু শুনব যে, সেটা আল্লাহর নির্দেশ বা নিষেধ, আমরা বিনা বাক্যে সেটা পালন করার চেষ্টা করব। আল্লাহর কোনো নির্দেশ বা নিষেধ আমাদের যুক্তিতে ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, আল্লাহর কোনো নির্দেশে চ্যালেঞ্জ করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ করতে বলেছেন, এতটুকুই যথেষ্ট।

আল্লাহর নির্দেশের ক্ষেত্রে শোনামাত্রই মেনে চলা হলো মুসলিমের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে বলেছেন। আমরা যদি এখন ‘বুঝা’ শুরু করে দিই যে, আল্লাহ কেন ৫ ওয়াক্ত বলেছেন, কেন ৬ ওয়াক্ত বলেননি, কেন ৪ ওয়াক্ত

বলেননি, এগুলো বুঝা শেষে নামাজ পড়া শুরু করব; তাহলে হবে না।

ইব্রাহিম ﷺ যদি যুক্তি দিয়ে আল্লাহর নির্দেশ পর্যালোচনা করতেন, তাহলে সেটা মানা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াত। যেই আল্লাহ তাঁকে এত বছর পর সন্তান দিলেন, সেই সন্তানকে তিনি কীভাবে নিজের হাতে জবাই করবেন? এটা যুক্তি দিয়ে মানা সম্ভব? একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো আল্লাহর বিধানের কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা।

একদিন ইব্রাহিম ﷺ ছেলেকে কুরবানি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। পথিমধ্যে শয়তান তাঁকে বাধা দিতে লাগল। ইব্রাহিম ﷺ শয়তানকে তাড়ানোর জন্য ৭ বার পাথর নিক্ষেপ করলেন। নবি ইব্রাহিমের ﷺ সেই সূনাত আজও মুসলিমরা হজের সময় পালন করে।

ছেলেকে মাটিতে শুইয়ে যখন জবাই করতে যাবেন, তখন আল্লাহ তাঁর উপর ওহি নাজিল করলেন। আল্লাহ বলেন:

“হে ইব্রাহিম! তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। নিশ্চয়ই আমি
এভাবে সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট
পরীক্ষা।”

[সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০৪-১০৬]

আল্লাহ চাননি যে, নবি ইব্রাহিম ﷺ তাঁর আদরের সন্তানকে জবাই করুন। আল্লাহ চেয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁর নবিকে যে প্রিয় সন্তান দান করেছেন, সেটাকে তাঁর রাস্তায় উৎসর্গ করতে তিনি প্রস্তুত কিনা।

কুরবানিতে আমরা উট, গরু, ছাগল কুরবানি করি। আমরা যে পশুগুলো কুরবানি করি, আল্লাহর কাছে তো সেই পশুগুলোর মাংস, রক্ত পৌঁছে না। তবুও আমরা কেন বলি যে, আমরা আল্লাহর জন্য কুরবানি করি?

কারণ, আমাদের কুরবানির মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর বিধান পালন করা। আমরা কতটা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর ভয়কে সামনে রেখে কুরবানি করছি সেটাই আল্লাহ দেখতে চান। এজন্য আল্লাহ বলেন:

“আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর মাংস, রক্ত; বরং তাঁর কাছে
পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।”

[সূরা আল-হাজ্জ ২২:৩৭]

নবি ইব্রাহিমকে ﷺ তাঁর ছেলেকে কুরবানির নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ মূলত তাঁকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেই পরীক্ষায় পিতা-পুত্র দুজনই উত্তীর্ণ হোন। পরবর্তীতে আল্লাহ একটি দুম্বা প্রেরণ করেন কুরবানির জন্য। ইব্রাহিম ﷺ সেটা কুরবানি করেন। সেই থেকে মুসলিমরা নবি ইব্রাহিমের ﷺ সূনাতানুসারে পশু কুরবানি করে যাচ্ছে।